- রপ্তানি এক বছরে ২৩ শতাংশ কমে যাওয়ার মধ্য দিয়ে প্রশ্ন উঠেছে যে বাংলাদেশ শুল্কমুক্ত সুবিধাকে কতটা অর্থবহভাবে কাজে লাগাতে পারছে
- ভারতকে পণ্যের চালান পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সময় কমানোসহ অশুল্ক প্রতিবন্ধকতা অপসারণে এখনো বেশ কিছু কাজ করতে হবে
- কাটসের সমীক্ষা বলছে, দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের মোট ব্যয় ২৪ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে আনা সম্ভব। তাহলে অন্তত ১০০ কোটি ডলার সাশ্রয় হবে।

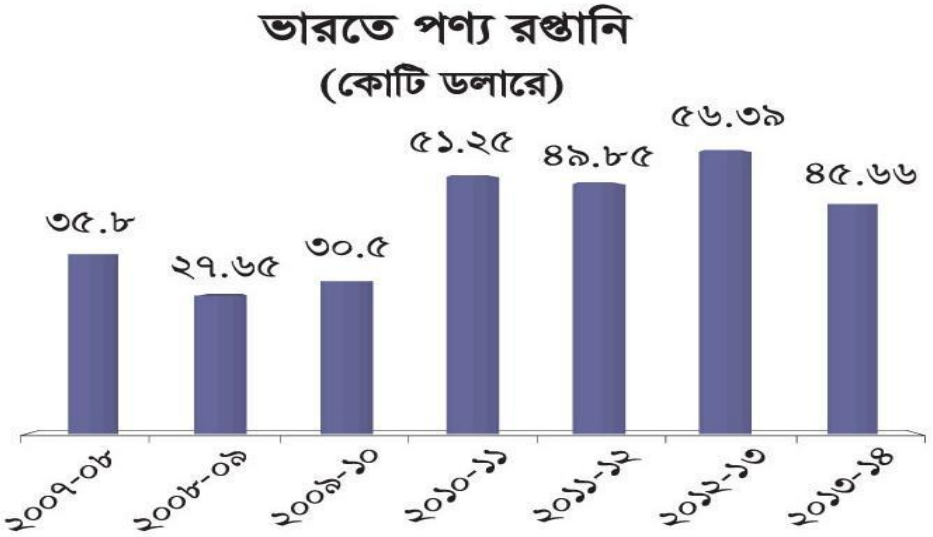

ভারতে পণ্য রপ্তানিতে বিপর্যয়!

আসজাদুল কিবরিয়া

প্রতিবেশী ভারতে পণ্য রপ্তানিতে বাংলাদেশ যেন সুবিধা করে উঠতে পারছে না কোনোভাবেই। ভারত শতভাগ (২৫টি পণ্য বাদে) শুল্কমুক্ত বাজারসুবিধা প্রদান করার পরও বাংলাদেশ থেকে ভারতে রপ্তানি কাঙ্ক্ষিত হারে বাড়েনি। বরং এক বছর রপ্তানি বাড়ছে তো পরের বছরই তা আবার কমে যাচ্ছে। এ ধারাবাহিকতাতেই গত ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ভারতে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি ২৩ শতাংশ কমে গেছে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর হালনাগাদ পরিসংখ্যান অনুসারে গত অর্থবছরে ভারতে বাংলাদেশি রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে ৪৫ কোটি ৬৬ লাখ (৪৫৬ দশমিক ৬ মিলিয়ন) ডলার। আর ২০১২-১৩ অর্থবছরে এ রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ৫৬ কোটি ৩৯ লাখ ডলার। অবশ্য তার আগের বছর, ২০১১-১২ অর্থবছরে বাংলাদেশ ভারতে ৪৯ কোটি ৫১ লাখ ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছিল। তবে ২০১১ সালের নভেম্বর মাসে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং দক্ষিণ এশিয়ার স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য ভারতের স্পর্শকাতর পণ্যতালিকা ৪৮০টি থেকে কমিয়ে ২৫টিতে নামিয়ে আনার ঘোষণা দেন। এর মধ্য দিয়েই কার্যত বাংলাদেশকে ভারতের বাজারে বহুল কাঙ্ক্ষিত প্রায় শতভাগ শুল্কমুক্ত বাজারসুবিধা প্রদান করা হয়। তবে এর তাৎক্ষণিক কোনো সুফল তখন মেলেনি। কেননা, ২০১০-১১ অর্থবছরে যেখানে ভারতে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি থেকে আয় হয়েছিল ৫১ কোটি ২৫ লাখ ডলার, সেখানে পরের বছর (২০১১-১২) তা ৫ শতাংশ কমে হয় ৪৯ কোটি ৫১ লাখ ডলার।

সেই সময় বলা হয়েছিল যে রপ্তানির এ পতন সাময়িক যা পরবর্তী সময়ে ঘুরে দাঁড়াবে। এ ধারণার সমর্থন মিলে যায় ২০১২-১৩ অর্থবছরে যখন ভারতে রপ্তানি ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তার পরের বছর (২০১৩-১৪) রপ্তানির ২৩ শতাংশ পতনের মধ্য দিয়ে প্রশ্ন উঠেছে যে বাংলাদেশ শুল্কমুক্ত সুবিধাকে কতটা অর্থবহভাবে কাজে লাগাতে পারছে। বিশ্লেষকেরা অবশ্য বলছেন যে একাধিক কারণে গত বছর ভারতে রপ্তানি কমে গেছে। এর মধ্যে কিছু কারণ সাময়িক প্রভাবজনিত হলেও বাকি কারণ দীর্ঘ মেয়াদে বিবেচনার যোগ্য।

ডলার ও ইউরোসহ প্রধান মুদ্রাগুলোর বিপরীতে ভারতীয় মুদ্রা রুপির বড় ধরনের দরপতন ঘটে গত দেড় বছরে। একই সময়ে ডলার-ইউরোর বিপরীতে বাংলাদেশি টাকার বিনিময় হার মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল। ফলে বাংলাদেশি পণ্য ভারতে তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল হয়ে ওঠে। আর ভারতীয় পণ্য বাংলাদেশে হয়ে ওঠে তুলনামূলকভাবে সাশ্রয়ী। এ জন্য একদিকে বাংলাদেশ থেকে ভারতে পণ্য আমদানি কমে যায়, অন্যদিকে ভারত থেকে পণ্য আমদানি বেড়ে যায়। গত অর্থবছর ভারত থেকে পণ্য আমদানির পূর্ণ হিসাব এখনো বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে পাওয়া যায়নি। তবে ভারতীয় অর্থবছরের সময়কাল (এপ্রিল-মার্চ) বিবেচনায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ভারত বাংলাদেশে প্রায় ৬০০ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে। অর্থাৎ এ পরিমাণ পণ্য বাংলাদেশ ভারত থেকে আমদানি করেছে। ভারত থেকে পণ্য আমদানি বৃদ্ধি ও সে দেশে বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানি হ্রাস স্বাভাবিকভাবেই দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে ভারসাম্য বাংলাদেশের প্রতিকূলে ঠেলে দিয়েছে। বরাবরের বাণিজ্য-ঘাটতি এবার আরও বেড়েছে।

তবে রুপির দরপতন তথা বিনিময় হারের প্রবণতা দিয়ে ভারতে বাংলাদেশি পণ্যের রপ্তানি কমে যাওয়ার বিষয়টি পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। একইভাবে শুল্ক বাধা না থাকলে বিভিন্ন ধরনের অশুল্ক বাধা যে এখনো রয়ে গেছে, সেগুলোও রপ্তানি কমে যাওয়ার জন্য এককভাবে দায়ী নয়। কেননা, নানা ধরনের অশুল্ক পদক্ষেপ এখনো স্বীকৃত, যেগুলো বাণিজ্যে বাধা তৈরি করলেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিধিবিধানের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ নয়। তবে যেসব অশুল্ক পদক্ষেপ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) বিধিমালার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয় এবং আমদানি-রপ্তানিতে বাধা সৃষ্টি করছে, সেগুলো অশুল্ক প্রতিবন্ধকতা।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউটের পরিচালক মোস্তফা আবিদ খান বলেন, 'অশুল্ক প্রতিবন্ধকতা অপসারণে এখনো বেশ কিছু কাজ করতে হবে ভারতকে। যেমন, বাংলাদেশের পণ্যের জন্য বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউটের (বিএসটিআই) মান সনদকে স্বীকৃতি প্রদান করা। ভারত বিএসটিআইকে অ্যাক্রিডিটেশন দিয়েছে। তবে এটি কার্যকর করতে ওই দেশে যে বিধিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন, তা এখনো করা হয়নি। ফলে বিএসটিআইয়ের সনদ স্বীকৃতি দিতে আইনত ভারত এখনো বাধ্য নয়। আবার কিছু ক্ষেত্রে অগ্রগতিও আছে। যেমন, কোনো প্রতিষ্ঠানের একই পণ্যের পরপর পাঁচটি রপ্তানি চালান পরীক্ষা করে সে দেশে প্রবেশ করা হলে পরবর্তী চালানগুলো আর পরীক্ষার কোনো প্রয়োজন হয় না।'

আবার কয়েক বছর আগে মেট্রোপলিটন চেম্বার সুপারিশ করেছিল যে বাংলাদেশি পণ্যের নমুনা ভারতীয় পরীক্ষাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তার ফলাফল ডাকযোগে সীমান্তে শুল্ক কর্তৃপক্ষের কাছে না পাঠিয়ে ফ্যাক্স বা ই-মেইল করে পাঠানোর জন্য। তাহলে তা সময়সাশ্রয়ী হয়। পচনশীল বা আধা পচনশীল পণ্যের ক্ষেত্রে এটি খুবই সহায়ক হয়। তবে এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

আগরতলা সীমান্তে প্রবেশের অপেক্ষায় বাংলাদেশি পণ্যবাহী ট্রাক ● ছবি : সংগৃহীত

এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক সেলিম রায়হান বলেন, 'অশুল্ক বাধা এখনো দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ জন্য দুই দেশকেই কাজ করতে হবে। পাশাপাশি বাংলাদেশি পণ্যের চাহিদা কীভাবে আরও বাড়তে পারে, সেদিকে নজর দিতে হবে। ভারতীয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সম্প্রতি জানিয়েছেন যে বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক রপ্তানি বাড়লেও সনাতনি কিছু পণ্য রপ্তানি কমেছে। তাই মোট রপ্তানি কমেছে। বিষয়টি ভালোভাবে খতিয়ে দেখা দরকার।'

বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানি বাড়ানোর জন্য বিদ্যমান অশুল্ক বাধাগুলো অপসারণ এবং অবকাঠামোসংক্রান্ত সমস্যাগুলোর সমাধান করার ওপর জোর দিয়েছে ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী সংগঠন কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ (সিআইআই)। সিআইআই একই সঙ্গে বাংলাদেশে ভারতীয় বিনিয়োগ বাড়ানোর ওপরও জোর দিয়েছে।

স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত, মানে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে ভারতীয় বিনিয়োগের মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৫০ কোটি ডলার। এর মধ্যে গত বছর এসেছে চার কোটি ২০ লাখ ডলার, যেখানে মোট বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১৭৩ কোটি ডলার।

এদিকে ভারতের জয়পুরভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান কনজ্যুমার ইউনিটি অ্যান্ড ট্রাস্ট সোসাইটি (কাটস) সম্প্রতি এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলেছে, দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে দুই দেশ যদি যথাযথ মান অনুসরণ করে, তাহলে এই বাণিজ্যের মোট বর্তমান ব্যয় ২৪ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে আনা সম্ভব। আর তা কমিয়ে আনার মানে হলো অন্তত ১০০ কোটি ডলার সাশ্রয় হওয়া। বাণিজ্যের ব্যয় বলতে পণ্য আমদানি-রপ্তানিতে অবকাঠামো ব্যবহারজনিত ব্যয়, পরিবহন খরচ ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে।